سورة الطلاق

সূরা তালাক

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ
تُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ
اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ
سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ স্বীয় কাজ পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে

সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (৭) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পয়গম্বর (সা)! (আপনি লোকদেরকে বলে দিন ঃ) তোমরা যখন (এমন) স্ত্রী-দেরকে তালাক দিতে চাও, (যাদের সাথে নির্জনবাস হয়েছে। কেননা, এমন স্ত্রীদের সাথেই ইদ্দতের বিধান সম্পৃক্ত ; যেমন অন্য এক আয়াতে আছে ঃ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ) তখন তাদেরকে ইদ্দতকালের (অর্থাৎ হায়েযের) পূর্বে (অর্থাৎ পবিত্র থাকা অবস্থায়) তালাক দাও। (সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই অবস্থায় তালাকের পূর্বে সহবাসও না হওয়া চাই)। এবং (তালাক দেওয়ার পর তোমরা) ইদ্দতের হিসাব রাখ। (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সবাই হিসাব রাখবে। তবে নারীরা সাধারণত ভুলে যায় বিধায় বিশেষভাবে পুরুষদেরকে হিসাব রাখতে বলা হয়েছে)। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় কর। (অর্থাৎ এসব অধ্যায়ে তাঁর যেসব বিধান রয়েছে, সেগুলো লংঘন করো না ; উদাহরণত এক দফায় তিন তালাক দিয়ো না, হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়ো না এবং ইদ্দতকালে স্ত্রীদেরকে) তাদের (বসবাসের) গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। (কারণ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরও বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় বসবাসের অধিকার রয়েছে)। এবং তারাও যেন নিজেরা বের না হয় (কারণ, বসবাসের অধিকার কেবল স্বামী প্রদত্ত হক নয় যে, সে ইচ্ছা করলে তা রহিত হয়ে যাবে ; বরং এটা শরীয়ত প্রদত্ত হক)। যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। উদাহরণত তারা ব্যভিচার অথবা চৌর্য কর্মে লিপ্ত হলে শাস্তিস্বরূপ বহিষ্কার করা হবে। কোন কোন আলিম বলেন ঃ কটুভাষিণী হলে এবং সার্বক্ষণিক কলহে লিপ্ত হলেও তাদেরকে বহিষ্কার করা জায়েয)। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে, (উদাহরণত স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়) সে নিজেরই ক্ষতি করে অর্থাৎ গোনাহ্গার হয়। অতঃপর তালাকদাতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন তালাকের মধ্যে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়াই উত্তম। ইরশাদ হয়েছে ঃ হে তালাক-দাতা) তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় (তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি) করে দেবেন (যেমন তালাকের জন্য অনুতপ্ত হবে। তখন প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হলে ক্ষতিপূরণ সহজ হবে)। অতঃপর তারা (অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা

স্ত্রীরা) যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে (এবং ইদ্দত শেষ না হয়), তখন (তোমাদের দু'রকম ক্ষমতা আছে, হয়) তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় (প্রত্যাহার করত) বিবাহে রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ ইদ্দতের শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় পথ অবলম্বন করবে না যে, রাখাও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করে নেবে)। এবং (যাই কর, রাখ অথবা ছাড়, তার জন্য) তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। [এটা মোস্তাহাব (হিদায়া, নিহায়া) প্রত্যাহারের বেলায় এজন্য সাক্ষী রাখতে হবে, যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী ভিন্নমত ব্যক্ত না করে এবং ছেড়ে দেওয়ার বেলায় এজন্য, যাতে নিজের মনই দুষ্টুমিতে প্ররৃত্ত না হয় এবং প্রত্যাহার করেছিল বলে মিথ্যা দাবী না করে বসে। হে সাক্ষিগণ, যদি সাক্ষ্য দানের প্রয়োজন হয়, তবে] তোমরা ঠিক ঠিক আল্লাহ্র উদ্দেশে (কোনরূপ খাতির না করে) সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। (উদ্দশ্য এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তিই উপদেশ দ্বারা লাভবান হয়। নতুন উপদেশ সবার জন্য ব্যাপক। এখন উপরে নির্দেশিত তাকওয়ার কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য (ক্ষয়ক্ষতি থেকে) নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং (অনেক উপকার দান করেন। তন্মধ্যে একটি বড় উপকার হচ্ছে রিযিক। অতএব) তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক পৌঁছান, যা তার ধারণাও থাকে না। (তাকওয়ার অপর শাখা হচ্ছে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। এর বৈশিষ্ট্য এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার (কার্যোদ্ধারের) জন্য তিনিই যথেষ্ট। (অর্থাৎ তিনি নিজে যথেষ্ট হওয়ার প্রতিক্রিয়া কার্যোদ্ধারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। নতুবা তিনি সারা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট। এই কার্যোদ্ধারও ব্যাপক---অনুভূত হোক কিংবা অননুভূত হোক। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কাজ (যেভাবে চান) পূর্ণ করে ছাড়েন। (এমনিভাবে কার্যোদ্ধারের সময়ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ (স্বীয় জ্ঞানে) স্থির করে রেখেছেন। (তদনুযায়ী তা বাস্তবায়িত করাই প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। অতঃপর আবার বিধানাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উপরে ইদ্দত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন বিস্তারিত বিবরণ এই যে) তোমাদের (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীদের মধ্যে যারা (বেশী বয়স হওয়ার কারণে) ঋতুবতী হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদ্দত কি হবে, সে) ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে (যেমন বাস্তবে সন্দেহ হয়েছিল এবং প্রশ্ন উঠেছিল) তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও হায়েযের বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনরূপ (তিন মাস) ইদ্দত হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সন্তান পূর্ণাঙ্গ প্রসব হোক কিংবা অপূর্ণাঙ্গ। যদি কোন অঙ্গ এমনকি, একটি অঙ্গুলিও গঠিত হয়ে থাকে। তাকওয়া নিজেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া উল্লিখিত পাথিব ব্যাপারাদি সম্পকিত বিধানাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে যে, পাথিব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক? যেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই চলবে। তাই অতঃপর আবার তাকওয়ার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেন। (সেটা ইহকালের কাজ হোক কিংবা পরকালের

বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এরপর তাকীদের জন্য বলা হচ্ছেঃ) এটা (অর্থাৎ যা বর্ণিত হল) আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি (এসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও) আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন (যা সর্ববৃহৎ বিপদমুক্তি) এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন (যা সর্ববৃহৎ উপকার লাভ। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তাদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছেঃ অর্থাৎ ইদ্দতে স্ত্রীদের আরও অধিকার আছে। তা এই যে) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তাকে ইদ্দতে বাসগৃহ দেওয়াও ওয়াজিব তবে বাইন তালাকে উভয়ের এক গৃহে নির্জনবাস জায়েয নয়; বরং উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা জরুরী)। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে (বাসগৃহের ব্যাপারে) সংকটাপন্ন করো না (উদাহরণত এমন কিছু করো না, যাতে সে উত্ত্যক্ত হয়ে বের হয়ে যায়)। যদি তালাকপ্রাপ্তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের (পানাহারের) ব্যয়ভার বহন করবে। (গর্ভবতী নয় ---এমন স্ত্রীদের বিধান এরূপ নয়। তাদের ভরণ-পোষণের মেয়াদ তিন হায়েয অথবা তিন মাস। এসব বিধান ইদ্দত সম্পর্কে বর্ণিত হল। ইদ্দতের পর) যদি তারা (পূর্ব থেকে সন্তানওয়ালী হোক কিংবা সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত শেষ হোক) তোমাদের সন্তানদেরকে (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে (নির্ধারিত) পারিশ্রমিক দেবে এবং (পারিশ্রমিক সম্পর্কে) পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (অর্থাৎ স্ত্রী বেশী দাবী করবে না যে, স্বামী অন্য ধাত্রী খোঁজ করতে বাধ্য হয় এবং স্বামীও এত কম পারিশ্রমিক দিতে চাইবে না, যাতে স্ত্রীর কাজ না চলে। বরং উভয়ই যথাসম্ভব চেষ্টা করবে, যাতে মাতাই সন্তানকে স্তন্যদান করে। এটা সন্তানের জন্য বেশী উপকারী) তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (অর্থাৎ তখন অন্য নারী খুঁজে নাও---মাতাকে বাধ্য করো না এবং পিতাকেও না। এই খবরসূচক বাক্যে পুরুষকে অল্প পারিশ্রমিক দিতে চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, কোন-না-কোন নারী তো স্তন্যদান করবে এবং সে-ও সম্ভবত কম পারিশ্রমিক নেবে না। এমতাবস্থায় মাতাকেই কম দিতে চাও কেন? স্ত্রীকেও বেশী পারিশ্রমিক চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, তুমি স্তন্যদান না করলে অন্য কেউ স্তন্যদান করবে। দুনিয়াতে তুমিই তো একা নও যে, এত বেশী পারিশ্রমিক দাবী কর। অতঃপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী (সন্তানের জন্য) ব্যয় করবে। যার আমদানী কম সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। (অর্থাৎ গরীব ব্যক্তি গরীবানা মতে ব্যয় করবে। কেননা) আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। (গরীব ব্যক্তি যেন ভয় না করে যে, ব্যয় করলে কিছুই থাকবে না; যেমন কেউ কেউ এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করে দেয়। তাই ইরশাদ হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কষ্টের পর সুখ দেবেন (যদিও তা প্রয়োজন মাফিকই হয়)। এর অনুরূপ অন্য আয়াতে আছেঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ

خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিবাহ ও তালাকের শরীয়তসম্মত মর্যাদা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থা ঃ সূরা বাকারার তফসীরে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে তা এই যে, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটি প্রত্যেক ধর্মে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন নয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা করে নেবে বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকই স্মরণাতীতকাল থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব ব্যাপার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশেষ পবিত্র এবং ধর্মের নির্দেশানুযায়ীই এসব কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিতাবধারী ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় তো একটি ঐশী ধর্ম ও ঐশী কিতাবের সাথে সম্পর্কযুক্তই। তাতে শত শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা আজও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় বিধিবিধানের অনুসরণ করে। কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায় কোন ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অধিকারী নয় কিন্তু কোন-না-কোন প্রকারে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। যেমন হিন্দু, আর্য, শিখ, অগ্নিপূজারী, নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তারাও বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারাদিকে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন মনে করে না। তারাও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে অপরিহার্য জ্ঞান করে। ধর্মের এসব নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধর্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল নাস্তিক ও আল্লাহ্ অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ্ ও ধর্মের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করে রয়েছে। তারা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুরূপ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, এর লক্ষ্য তাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিতাপের বিষয়, আজকাল বিশ্বে এই মতবাদই ব্যাপক প্রসার লাভ করছে, যা মানুষকে জংলী-জানোয়ারদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিবাহকে কেবল একটি লেনদেন ও চুক্তি নয় বরং এক প্রকার ইবাদতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই ইবাদতের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবচরিত্রে গচ্ছিত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উত্তম ও পবিত্র উপকরণও রয়েছে এবং নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালনের সুষম ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপর সাধারণ মানবগোষ্ঠীর সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল। তাই কোরআন পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদিকে অন্যসব বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। কোরআন পাঠে গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তি এটা প্রত্যক্ষ করবে যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদি। কোরআন পাক এসব বিষয়ের কেবল নীতিই ব্যক্ত করেছে। এগুলোর শাখাগত ব্যাপারাদির বর্ণনা কোরআন পাকে খুবই বিরল। কিন্তু কোরআন পাক বিবাহ ও তালাকের শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং এসবের অধিকাংশ শাখাগত মাস'আলা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে নাযিল করেছেন।

এসব মাস'আলা কোরআনের অধিকাংশ সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সূরা নিসায় অধিক

বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা তালাকে' বিশেষভাবে তালাক, ইদ্দত ইত্যাদির বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে একে 'সূরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়েছে।---(কুরতুবী)

ইসলামী মূলনীতির গতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন স্থায়ী সম্পর্ক হতে হবে, যাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশোধিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিত্রও সংশোধিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এই সম্পর্ককে সকল প্রকার তিক্ততা ও মন কষাকষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোন সময় তিক্ততা হয়ে যায়, তবে তা নিরসনের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তালাকের বিধান নেই, সেগুলোতে এরূপ পরিস্থিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং মাঝে মাঝে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাকের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই ঘৃণার্হ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণার্হ বিষয় হচ্ছে তালাক। হযরত আলী (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه عرش الرحمن —অর্থাৎ বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাকের কারণে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠে। হযরত আবূ মূসা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন ব্যভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রীদেরকে তালাক দিও না। কারণ, যেসব পুরুষ ও নারী কেবল স্বাদ আস্বাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।---(কুরতুবী) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে দাসদেরকে মুক্ত করা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ ও অপছন্দনীয়।---(কুরতুবী)

সারকথা, ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারণ করেছে কিন্তু কোন কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্ম এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুন্দরভাবে ও যথোপযুক্ত পন্থায় নিষ্পন্ন হতে হবে---একে নিছক মনের ঝাল মিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার খেলায় পরিণত করা যাবে না। আলোচ্য সূরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'হে নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোন বিধান বিশেষভাবে রসূলের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রসূল' বলে সম্বোধন করা হয়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ—বাক্যের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনের বিধান বর্ণনা করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষ-ভাবে আপনার জন্য নয়---সমগ্র উম্মতের জন্য।

কেউ কেউ এ স্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন যে, হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান—فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ—عدت-এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। এক. স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদ্দতকে 'ইদ্দতে-ওফাত' বলা হয়। গর্ভবতী নয়--এমন মহিলাদের জন্য এই ইদ্দত চার মাস দশ দিন। দুই. বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়---এমন মহিলাদের জন্য তালাকের ইদ্দত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েয। ইমাম শাফেয়ী (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তোহ্র (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্য কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েয হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত একই রূপ। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতকে فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ও এক রেওয়ায়েতে فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ বর্ণিত আছে। ---(রূহুল-মা'আনী)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) একথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায হয়ে বললেন ঃ

ليرا جعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة التى امرها الله تعالى ان يطلق بها النساء ـ

তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ্ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়--এক. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। দুই. কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া ওয়াজিব [যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রা)-এর ঘটনায় তদ্রূপই ছিল]। তিন. যে তোহ্‌রে তালাক দেবে, সেই তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। চার. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে হায়েয থেকে ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, সেই তোহরে সহবাস করবে না এবং তোহরের শেষ ভাগে হায়েয আসার পূর্বে তালাক দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে ইদ্দত তোহ্‌র থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহ্‌রের শুরুতেই তালাক দেবে। ইদ্দত তিন হায়েয হবে, না তিন তোহর হবে---এই আলোচনা সূরা বাকারার

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ বাক্যে করা হয়েছে।

সারকথা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানা গেল যে, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম এবং যে তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহরে তালাক দেওয়াও হারাম। উভয় ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ হল স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কষ্টকর। কেননা, যে হায়েযে তালাক দেবে, সেই হায়েয তো ইদ্দতে গণ্য হবে না বরং হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মযহাব অনুযায়ী পরবর্তী তোহ্‌রও অযথা অতিবাহিত হয়ে দ্বিতীয় হায়েয থেকে ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। এভাবে দীর্ঘদিন পর ইদ্দত শেষ হবে। শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ীও ইদ্দতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েযের অবশিষ্ট দিনগুলো কমপক্ষে বেশী হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ

করে যে, তালাক কোন রাগ মিটানোর অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় নয় বরং এটা অপারক অবস্থায় উভয় পক্ষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। তাই তালাক দেওয়ার সময়েই এদিক খেয়াল রাখা জরুরী যে, স্ত্রীকে যেন দীর্ঘদিন ইদ্দত অতিবাহিত করার অহেতুক কষ্ট ভোগ করতে না হয়। এই বিধান কেবল সেই স্ত্রীদের জন্য, যাদের পক্ষে হায়েয অথবা তোহর দ্বারা ইদ্দত অতিবাহিত করা জরুরী। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীর সাথে এখনও স্বামীর নির্জনবাসই হয়নি, তার যেহেতু কোন ইদ্দতই নেই, তাই তাকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয। এমনিভাবে যেসব স্ত্রীর স্বল্প বয়স অথবা বেশী বয়স হেতু হায়েয আসে না, তাদেরকে যে কোন অবস্থায় এমনকি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া জায়েয। কেননা তাদের ইদ্দত মাসের হিসাবে তিন মাস হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে একথা বর্ণিত হবে।--(মাযহারী)

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ । إحصاء শব্দের অর্থ গণনা করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সযত্নে স্মরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেওয়ার মত ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গত তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ — অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কৃপা নয় বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহ্রও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মযহাব তাই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ — অর্থাৎ ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

এক. নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয় বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণত এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষ্যত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলা বাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয় বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয় বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সুদ্দী, ইবনে সায়েব, নাখয়ী (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।---(রূহুল মা'আনী)

দুই. নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্হাক, ইকরিমা (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।

তিন. নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর কেরাত এরূপ إِلَّا أَنْ يُفْحِشْنَ এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।----(রূহুল মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

এ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হল। পরে আরও বিধান বর্ণিত হবে। কিন্তু মাঝখানে বর্ণিত বিধানসমূহের প্রতি জোর দেওয়া এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতিপয় উপদেশ বাক্যের অবতারণা করা হচ্ছে। কোরআন পাকের বিশেষ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেক বিধানের পর আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তা স্মরণ করিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাপ্য পূর্ণরূপে আদায় করার ব্যবস্থা কোন আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ভীতি ও পরকাল চিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ - لَاتَدْرِيْ لَعَلَّ

اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا—حُدُوْدُ اللّٰهِ বলে শরীয়তের নির্ধারিত আইন-কানূন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে অর্থাৎ আইন-কানূনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে অর্থাৎ আল্লাহ্ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ্ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌঁছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয় বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। এক. আল্লাহ্র নির্ধারিত আইন-কানূন লংঘন করার শাস্তি এবং দুই. স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি। এর স্বরূপ এই ঃ

پنداشت ستمگر جفا بر ما کرد
برگردن وے بماند و بر ماگذشت

لَاتَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا অর্থাৎ তুমি জান না সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা এই রাগ-গোসার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেওয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানূনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ব বিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পুনর্বিবাহও হালাল হয় না।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

—এখানে اجل শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং اجل পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম, না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া ভাল। এ চিন্তার জন্য এ সময়টি উত্তম। কারণ, তত দিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোসা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্য দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান ঃ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার-- উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারূফ অর্থাৎ যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারূফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পন্থা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজেকর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্য সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন্ বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফিকহ্র কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দেবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দেবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোসা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে। উদাহরণত এরূপ বলবে না, আমার বাড়ী থেকে বের হয়ে যাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিচ্ছি, এখন তোমার সাথে আমার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক রইল না। এ ধরনের বাক্য পরিষ্কার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়তে কেবল এ ধরনের বাক্য বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং শরীয়তের পরিভাষায় 'বাইন' তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিক-ভাবে ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকে না। তদপেক্ষা কঠোর তালাক হচ্ছে তালাককে তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া। এর ফলশ্রুতিতে স্বামীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রহিত হয় না বরং ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারী উভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে চাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সূরা বাকারার আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

তিন তালাক একযোগে দেওয়া হারাম, কিন্তু কেউ দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) আছে ঃ আজকাল ধর্ম ও ধর্মীয় বিধানাবলীর প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, অনেক লেখাপড়া জানা দলীল লেখকরাও তিন তালাকের কম তালাককে যেন তালাকই মনে করে না। অথচ দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করা হয় যে, যারা তিন তালাক দেয়, তারা পরে অনুতাপ করে এবং স্ত্রী যাতে কোনক্রমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তায়ই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসায়ী (র) মাহমুদ ইবনে লবীদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একযোগে তিন তালাক দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উম্মতের ইজমাবলে একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও নাজায়েয। যদি কোন ব্যক্তি তিন তোহ্রে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেয়, তবে তাও অপছন্দনীয়। এ বিষয়টি উম্মতের ইজমা এবং কোরআনী আয়াতসমূহের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারাম ও বিদ'আতী তালাকের মধ্যে দাখিল কিনা, শুধু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এটা হারাম। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) হারাম বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপছন্দনীয় ও সুন্নত বিরোধী কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তফসীরে দেখুন।

কিন্তু একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম—এ ব্যাপারে যেমন সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে, তেমনি হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিন তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে। তিন তালাক একযোগে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত গোটা মযহাব চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একযোগে দিলেও তা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা কোন কাজ হারাম হলে তার প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রভাবিত হয় না। যেমন কেউ কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যা করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাবস্থায় মরেই যাবে। এমনিভাবে একযোগে তিন তালাক দেওয়া যদিও হারাম, তথাপি এর বাস্তবতা অপরিহার্য। কেবল মযহাব চতুষ্টয়ই নয় বরং সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ বিষয়েরও বিশদ বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ—অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর।

অষ্টম বিধান ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্য দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর

উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তী-কালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্য সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টুমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালবাসায় পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্য ذَوَىْ عَدْلٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সালা দেবে না। اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ—অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকাল উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধি-কার আদায় আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

অপরাধ ও শাস্তির আইন-কানূনে কোরআন পাকের অভূতপূর্ব প্রজ্ঞাভিত্তিক ও মুরুব্বী-সুলভ নীতি ঃ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে আইন-কানূন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং দেশে আইন-কানূন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা করা হয়। কোরআন পাকও আল্লাহ্ তা'আলার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনাভঙ্গি সারা বিশ্বের আইন পুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আল্লাহ্-ভীতি ও পরকাল চিন্তা দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোন পুলিশ ও পরিদর্শকের ভয়ে নয় বরং আল্লাহ্‌র ভয়ে আইন মেনে চলে এবং কেউ দেখুক কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরী মনে করে। একমাত্র এ কারণেই যারা কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখে, তাদের মধ্যে কঠোরতর আইন প্রয়োগ করাও তেমন কঠিন হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ ও তদুপরি গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কোরআন পাকের এই মুরুব্বীসুলভ নীতি সকল আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পরি-লক্ষিত হয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহে এই নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক কাজে কোন সাক্ষ্য সংগৃহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদ স্বামী-স্ত্রীরই অন্তর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই বিবাহের খুতবায়

কোরআন পাকের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুন্নতরূপে প্রমাণিত আছে ; সেই আয়াতত্রয় আল্লাহ্‌ভীতির আদেশ দ্বারা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারস্পরিক অধিকার আদায়ে ত্রুটি করলে, একে অপরকে কষ্ট দিলে আলিমুল গায়েব আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে সূরা তালাকে তালাকের কয়েকটি বিধান বর্ণনা করতে যেয়ে প্রথম বিধানের পরেই وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ বলে আল্লাহ্‌ভীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর চারটি বিধান উল্লেখ করার পর— وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এসব বিধান অমান্য করে, সে অন্য কারও উপর নয়, নিজের উপরই জুলুম করে। এর অশুভ পরিণতি তাকেই ছারখার করে দেবে। এরপর আরও চারটি প্রাসঙ্গিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ভীতির ফযীলত ও তার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইদ্দতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ্‌ভীতির আরও কল্যাণ ও ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সন্তানকে স্তন্যদানের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তালাক, ইদ্দত এবং স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ, স্তন্যদান ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও পরকাল চিন্তা, কোথাও আল্লাহ্‌ভীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওয়াক্কুলের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ভীতির বিষয়বস্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যত বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু কোরআনের উপরোক্ত মুরুব্বীসুলভ নীতির রহস্য বুঝে নেওয়ার পর এর গভীর মিল সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

—وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করেন।

تقوى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে تقوى তথা আল্লাহ্‌ভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে---এক. আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। দুই. তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মু'মিন-মুত্তাকীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না---(রূহুল মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন: তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলা বাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।---(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের শানে-নুযূল: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: আমার পুত্র সালেমকে শত্রুরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তার মা খুবই উদ্বিগ্না। এখন আমার কি করা উচিত? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: আমি তোমাকে ও ছেলের মাকে বেশী পরিমাণে 'লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' পাঠ করার আদেশ দিচ্ছি। তারা উভয়েই আদেশ পালন করলেন। এরই প্রভাবে গ্রেফতারকারী শত্রুরা একদিন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে ছেলেটি পলায়ন করে এবং ফেরার পথে শত্রুদের কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে পিতার কাছে নিয়ে আসে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে শত্রুদের একটি উট পেয়ে সে তাতে সওয়ার হয়ে যায় এবং আরও কয়েকটি উট এর সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা এই সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জ্ঞাত করান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি এই প্রশ্নও করেন যে, ছেলেটি যেসব উট ও ছাগল নিয়ে এসেছে, এগুলো আমার জন্য হালাল, না হারাম?

এর পরিপ্রেক্ষিতে وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ الخ আয়াতখানি নাযিল হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রের বিরহ যখন আওফ ইবনে মালেক (রা) ও তাঁর স্ত্রীকে অস্থির করে তুলল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনের

আদেশ দিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে, তাকওয়ার আদেশের সাথে সাথে 'লা-হাওলা' পাঠ করারও আদেশ দিয়েছিলেন।--- (রূহুল মা'আনী)

এই শানে-নুযূল থেকেও একথা জানা গেল যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপক।

মাস'আলা ঃ এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান যদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গনী-মতের মালরূপে গণ্য হবে এবং হালাল হবে। গনীমতের মালের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই ধনসম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সরকারী বায়তুলমালে দেওয়াও জরুরী নয়; যেমন হাদীসের ঘটনায় তা নেওয়া হয়নি। ফিকহ্‌বিদগণ বলেন ঃ কোন মুসলমান গোপনে ছাড়পত্র ছাড়াই দারুল হরব তথা শত্রুদেশে চলে গেলে যদি সেখান থেকে কাফিরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তা-ও হালাল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভিসা নিয়ে শত্রুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোন ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জায়েয নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বন্দী হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃপর কোন কাফির তার কাছে কোন অর্থ গচ্ছিত রাখে, সেই গচ্ছিত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ, ভিসা নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা চুক্তির বর-খেলাফ কাজ। শেষোক্ত মাস'আলায়ও আমানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত চুক্তি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন গচ্ছিত অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ফেরত না দেওয়া আত্মসাৎ ও চুক্তিভঙ্গের শামিল, যা শরীয়তে হারাম।---(মাযহারী)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হিজরতের পূর্বে অনেক কাফির অর্থ-সম্পদ আমানত রাখত। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এমন কিছু আমানত ছিল। তিনি এসব আমানত মালিককে প্রত্যর্পণের জন্য হযরত আলী (রা)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র ঃ উপরোক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) আওফ ইবনে মালেক (রা)-কে বিপদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পাঠ করতে বলেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) বলেন ঃ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার বিপদ ও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশী পরিমাণে এই কালেমা পাঠ একটি পরীক্ষিত আমল। হযরত মুজাদ্দিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই বেশীর পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক পাঁচশ বার এবং এর শুরুতে ও শেষে একশ বার করে দরূদ পাঠ করে উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করতে হবে।---(মাযহারী) হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ আবূ যর, যদি সব মানুষ কেবল এই আয়াতটি অবলম্বন করে নেয়, তবে এটা সবার জন্য যথেষ্ট। --(রূহুল মা'আনী)

অর্থাৎ সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য কামিয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ----অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার মুশকিল কাজের জন্য যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুযায়ী সবকাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا -

যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে।---(মাযহারী)

অবশ্য তাওয়াক্কুলের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট উপায়াদি ত্যাগ করা নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্ছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবলম্বন করবে কিন্তু উপায়াদির উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। কারণ, তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হতে পারে না। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ভীতি ও তাওয়াক্কুলের ফযীলত এবং বরকত বর্ণনা করার পর তালাক ও ইদ্দতের আরও কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَالّٰٓئِیْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓئِیْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান ঃ সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি, তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যত দিনেই হোক।

اِنِ ارْتَبْتُمْ—অর্থাৎ যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েয দ্বারা গণনা করা হয় কিন্তু এসব মহিলার হায়েয বন্ধ; অতএব তাদের ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে---এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার আল্লাহ্‌ভীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ—এটা আল্লাহ্‌র বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ্‌ভীতির পাঁচটি কল্যাণ ঃ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ভীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে----১. আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য ইহকাল ও পরকালের বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। ২. তার জন্য রিযিকের এমন দ্বার খুলে দেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। ৩. তার সব কাজ সহজ করে দেন। ৪. তার পাপসমূহ মোচন করে দন। ৫. তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্‌ভীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্‌ভীরুর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়। اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا—আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে

থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে উত্যক্ত করো না ঃ لَا تُضَارُّوهُنَّ—এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যখন ইদ্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাব পূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ—অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (র)-এর মতে তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন ঃ বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর দলীল পূর্বোক্ত এই আয়াত ঃ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ—কেননা, এই আয়াতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর কিরাত এরূপ ঃ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ—সাধারণত এক কিরাত অন্য কিরাতের তফসীর করে। অতএব প্রসিদ্ধ কিরাতে যদিও أَنْفِقُوا শব্দটি উল্লিখিত নেই কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কিরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিম্মায় অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-কে তার স্বামী তিন তালাক

দিয়েছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেন নি। হযরত উমর (রা) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন ঃ আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আল্লাহ্র কিতাব বলে বাহ্যত এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত উমর (রা)-এর মতে ভরণ-পোষণও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রসূলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারে-কুতনী ও তিবরানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক-প্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফিকহ্‌বিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (র)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে দেখুন।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ — অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব হয়ে গেলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা স্তন্যদান করে, তবে স্তন্যদানের বিনিময় নেওয়া ও দেওয়া জায়েয।

দ্বাদশ বিধান ঃ স্তন্যদানের পারিশ্রমিক ঃ যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা স্বয়ং জননীর যিম্মায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে ঃ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ — যে কাজ কারও দায়িত্বে এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া ঘুষের শামিল, যা নেওয়া দেওয়া উভয়ই নাজায়েয। এ ব্যাপারে ইদ্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদ্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া জায়েয সাব্যস্ত করেছে।

ত্রয়োদশ বিধান ঃ ائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ -এর শাব্দিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশী না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

চতুর্দশ বিধান : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى —অর্থাৎ স্তন্যদান করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয় অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনত তাকে বাধ্য করা যাবে না বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়া-মমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করছে, তখন কোন বাস্তব ওযর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওযর না থাকে, কেবল রাগ-গোসার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে সে গোনাহ্‌গার হবে। তবে বিচারক তাকে স্তন্যদান করতে বাধ্য করবে না।

এমনিভাবে যদি স্বামী দারিদ্র্যের কারণে পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম হয় এবং অন্য কোন মহিলা বিনাপারিশ্রমিকে অথবা কম পারিশ্রমিকে স্তন্যদান করতে সম্মত হয়, তবে স্বামীকে জননীর দাবী মেনে নিয়ে তার স্তন্য পান করাতেই বাধ্য করা হবে না বরং উভয় অবস্থাতে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি অন্য মহিলা জননীর সমান পারিশ্রমিক দাবী করে, তবে সব ফিকহ্‌বিদের ঐকমত্যে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্বামীর জন্য জায়েয নয়।

মাস'আলা : অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্থির হলে স্তন্যদাত্রী মহিলা সন্তানকে তার জননীর কাছে রেখে স্তন্যদান করবে, এটা জরুরী। জননীর কাছ থেকে আলাদা করে স্তন্যদান করানো জায়েয নয়। কেননা, সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে 'হিযানত' তথা লালন-পালন ও দেখাশোনায় রাখা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে নেওয়া জায়েয নয়।--(মাযহারী)

পঞ্চদশ বিধান : স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিযিক সীমিত, সে আমদানী অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না বরং স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিত্তবান হলে বিত্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালিনী না হয় বরং দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালিনী হয়। ইমাম আযম (র)-এর মযহাব তাই। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের উক্তি এর বিপরীত।--(মাযহারী)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا —এটা

আগের বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবর করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঃ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا — অর্থাৎ কারো এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বর্তমান দারিদ্র্য চিরকাল বজায় থাকবে বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতে সেই স্বামীরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে।--(রূহুল মা'আনী)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا
شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ
عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚۛ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ
ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ
يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ
رِزْقًا ﴿١١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ
يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

(৮) অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তার রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে পাকড়াও করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি

দিয়েছিলাম। (৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (১০) আল্লাহ্ তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন, (১১) একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। (১২) আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছে, অতঃপর আমি তাদের (কাজকর্মের) কঠোর হিসাব নিয়েছি (অর্থাৎ তাদের কোন কুফরী কর্মই ক্ষমা করিনি বরং প্রত্যেকটির শাস্তি দিয়েছি। এখানে হিসাব বলে জিজ্ঞাসাবাদ বোঝানো হয়নি)। এবং আমি তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছি (অর্থাৎ শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছি)। তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (এ হচ্ছে দুনিয়াতে এবং পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (অবাধ্যতার পরিণাম যখন এই) অতএব হে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (ঈমানও তাই চায়। ভয় কর অর্থাৎ আনুগত্য কর। এই আনুগত্যের পন্থা বলে দেওয়ার জন্য) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশনামা প্রেরণ করেছেন (এবং এই উপদেশনামা দিয়ে) একজন রসূল (সা) (প্রেরণ করেছেন), যিনি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট বিধানাবলী পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (ঈমান ও সৎ কর্মের) আলোকে আনয়ন করেন। [উদ্দেশ্য এই যে, এই রসূল (সা)-এর মাধ্যমে যে উপদেশ পৌঁছে, তা মেনে চলাও আনুগত্য। অতঃপর আনুগত্য অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের জন্য ওয়াদা করা হচ্ছে যে] যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদেরকে) উত্তম রিযিক দিয়েছেন। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য অবশ্য পালনীয়। কারণ আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও তদনুরূপ (সাতটি সৃষ্টি করেছেন। তিরমিযীতে আছে, এক পৃথিবীর নিচে দ্বিতীয় পৃথিবী, তার নিচে তৃতীয় পৃথিবী, এভাবে সপ্ত পৃথিবী সৃজিত হয়েছে)। এসবের (অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর) মধ্যে তাঁর (আইনগত, সৃষ্টিগত অথবা উভয় প্রকার) বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়, (এসব কথা এজন্য বলা হয়েছে) যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ সবকিছুকে (স্বীয়) জ্ঞানের পরিধিতে বেষ্টন করে রেখেছেন (এতেই বোঝা যায় যে, তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا—আয়াতে উল্লিখিত এসব জাতির হিসাব ও আযাব পরকালে হবে কিন্তু এখানে একে অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েই গেছে।---(রূহুল মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয় বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا— বাক্যে বর্ণিত আযাব কেবল পরকালে হবে।

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا—এই আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, اَرْسَلَ শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাযিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণত 'যিকর'-এর অর্থ স্বয়ং রসূল (সা) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর হয়ে গেছেন।---(রূহুল মা'আনী)

সপ্ত পৃথিবীর কোথায় কোথায় কিভাবে আছে اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ—এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি, পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নিচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নিচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যেমন বিরাট ব্যবধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্ট জীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ মিথ্যা ও মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে

প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেনঃ ابهموا ما ابهمه الله অর্থাৎ যে বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষত বহমান তফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়---এমন নির্ভেজাল শিক্ষণীয় বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্র আদেশ দ্বিবিধ----(১) আইনগত, যা আল্লাহ্র আদিষ্ট বান্দাদের জন্য ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকায়েদ, ইবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে। এগুলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আল্লাহ্র তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধান সমগ্র সৃষ্ট বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃষ্ট জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্ট জীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।
